ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2264-2273
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.489

সেলিম আল দীনের নাটকে ধর্ম ও দর্শন: দেশজ নন্দনতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি অন্বেষণ

মো. দিদারুল ইসলাম, *প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ*

Received: 28.06.2026; Accepted: 15.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Selim Al Deen (1949–2008) was one of the profound playwrights of post-independent Bangladesh. Liberating from Eurocentric colonial paradigms, he profoundly redefined Bangladeshi theatre with his artistic vision of the revival of an Oriental narrative tradition, culminating in the creation of *Kathanatya* (narrative theatre) and *Upakhyan Natya* (epic-narrative drama). This research paper analyzes the deep connection of religion, philosophy, and indigenous aesthetics of his plays. This stylistic revolution in his plays was structurally grounded in the philosophical framework of *Dwaitadwaitabad* (Dualistic Non-dualism), which means existence of one in all and all exits in one. This is a common ground of oriental philosophy of **Vaishnavism**, the **Baul** tradition, **Nishkama Karma** (desireless action), and **Sankhya philosophy** including **Sufism**. This research uses Meticulous Textual and Literary Analysis methodology to demonstrate how Selim Al Deen's creative landscape deeply explores and synthesizes a rich tapestry of these philosophical systems in his plays like *Kirtankhola* (1980), *Keramotmongal* (1986), *Chaka* (1991), *Hargaj* (1992), *Hathodaye* (1997), *Prachiya* (1998), *Nimajjan* (2002), *Banpangshul* (2003), *Swarnaboal* (2007) and so on. In the light of post-colonialism as a theoretical framework, this paper explores how he incorporated indigenous aesthetics consciously de-linking from western centric dramaturgy. These plays depict the struggle for existence of indigenous and marginalized people, fair-centered cultural syncretism, and abstract modern reconstructions of folk tales. Structurally, Selim Al Deen established a trace indigenous aesthetic of poetry, music, and drama by restoring the performance elements of medieval Panchali. In conclusion, the research highlights Selim Al Deen's philosophical journey: how he transitioned from a basic critique of societal flaws into a mature, idealistic philosophy centered on *Manabdharma* (Humanism) and the whole of human existence. Ultimately, he goes beyond the traditional role of a playwright to become a monumental *Darshonik-Kothok* (Philosophical Narrator). His works are both universal and deeply rooted in our culture, creating a unique and independent identity for Bengali drama.

Keywords: Kathanatya (Narrative Theatre), Post-colonialism, Oriental Philosophy, Dwaitadwaitabad (Dualistic Non-Dualism), Indigenous Aesthetics, Philosophical Narrator (Darshonik-Kothok), Manabdharma (Humanism), Philosophical Narrator (Darshonik-Kothok)

১

এক গভীর দার্শনিক অন্বেষায় প্রাচ্য নাট্যরীতির পুনঃপত্তনের শিল্পযাত্রায় যিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্বতন্ত্র নন্দনতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ও বাংলার লোকায়ত দর্শনের প্রতিভূ তিনি আর কেউ নন, নাট্যচার্য সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮)। বাংলাদেশের এই নাট্যজন নাটককে কেবল মঞ্চের বিনোদন হিসাবে না দেখে একে এক চিরায়ত ও পূর্ণাঙ্গ শিল্পমাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।[১] তাঁর প্রাচ্যমুখী অভিযাত্রার রয়েছে দার্শনিক ভিত্তি। কেবল পশ্চিমা প্রভাবমুক্তি আর শেকড়ের সন্ধান নয়, বরং তাঁর শিল্পের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ গিয়ে পৌঁছেছে বাউল বৈষ্ণব-সূফীবাদের মরমী আধ্যাত্মিকতার অবারিত জ্ঞানসাগরে। যখন বাংলাদেশের নাট্যধারা পশ্চিমা শৈলীর অনুগামী হয়ে পুষ্ট হচ্ছিল, তখন তিনি বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারাকে বিস্মৃতির গহ্বর থেকে সর্বসমক্ষে আনার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। সজ্ঞানে পশ্চিমা শৈলী থেকে সরে আসার সে সিদ্ধান্তকে প্রাচীনত্বে স্থবির হয়ে থাকার নামান্তর মনে করাও কারণ নেই কেননা, তাঁর অভিষ্ট ছিল আধুনিক প্রেক্ষাপটে মূল ধারাটির সংস্থাপন এবং এর মাধ্যমে স্বতন্ত্র নাট্য নির্মাণ।[২] সেলিম আল দীনের শেকড়সন্ধানী প্রেরণা তাঁর একাডেমিক গবেষণা এবং ব্যক্তিগত জীবনবোধ থেকে উত্থিত। মধ্যযুগের বাংলা নাটক নিয়ে গবেষণার সূত্র ধরেই তাঁর এই প্রাচীন বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের নানা অনুষঙ্গের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রেম।[৩] বাংলার উপকূল অঞ্চল ঘেঁষা শৈশব-কৈশোরের অভিজ্ঞতা, বাংলা জনপদের প্রান্তিক মানুষের জীবনাচরণ ও সংস্কৃতিতে তিনি অন্বেষণ করেন নাটকের উপাদান।[৪] এই বাংলার মানুষের নিত্য যাপিত জীবনের কথায় তিনি শিল্পের সন্ধান পেয়েছেন, পেয়েছেন বাংলা নাটকের মূলরোম। আর তাইতো পাশ্চাত্য নাট্য-প্রকরণ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে বাঙালির নিজস্ব নাট্য কৌশল অবলম্বনে ব্যাপৃত হন তিনি।[৫] নিছক আঙ্গিকগত নিরীক্ষায় শৈলীগত প্রাচ্যযাত্রা নয়, বরং এটি তাঁর গভীর দার্শনিক অনিবার্যতার ফল।

সেলিম আল দীন দেখলেন, প্রাচ্য ভাব-বস্তুর সমগ্রতাকে পাশ্চাত্যের বস্তুকেন্দ্রীক চিন্তা পুরোপরি ধারণ করতে অক্ষম।[৬] যখন তিনি দেখলে, বাংলার প্রান্তিক মানুষ তথা প্রাকৃতজনের লোকাচার ও জটিল জীবনদর্শন তথা বাঙালি জীবনের ত্রিকাল-সঞ্চারী মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিকে পাশ্চাত্য নাট্যশৈলীর সীমিত কাঠামো পুরোপরি ধারণ করতে সক্ষম নয়, তখন তিনি এক নতুনতর মার্গ সন্ধান করলেন[৭], যেখানে বাংলা ভাষার সৃষ্টি ও হাজার বছরের আবহমান মহাকাব্যিক জীবনাখ্যান অনিবার্য হয়ে উঠলো।[৮] ফলে তাঁর নিজস্ব নাট্য-প্রকরণ হয়ে ওঠে বাঙালির জীবনবোধকে সামগ্রিকতায় তুলে ধারার দার্শনিক ভিত্তি।

সেলিম আল দীন ছিলেন দেশজ ভাবনায় জারিত নাট্যকার। দেশজ চেতনা ও জাতীয়তাবোধের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিকতার পথে উত্তরণের সোপান নির্মাণ করাই ছিল তাঁর নাট্যবিষয়শৈলীর ভূ-ভাগ। আর সেই ভূ-ভাগের দর্শনকে ঘিরেই তার সৃষ্ট দেশজ আঙ্গিক।[৯] তাঁর প্রগাঢ় ভাবনায় সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হয়েছে সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রদর্শন ও সরকার পদ্ধতি। ফলে, স্বধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র যখন বারবার শাসক দ্বারা শোষিত হয়েছে, সেলিম আল দীন তখন প্রান্তিক মানুষের জীবন এবং 'প্রাকৃত ধর্ম'কে নাটকের কেন্দ্রে এনে একটি বিকল্প সাংস্কৃতিক-দার্শনিক প্রতিরোধের পথ তৈরি করেন। প্রথম পর্যায়ের নাটকগুলোতে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, গ্রোটস্কির পুওর থিয়েটার থেকে নিয়ে ব্রেখটের এপিক থিয়েটার হয়ে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের তাত্ত্বিক ধারণাকে তিনি যেন এনে ঠেকালেন রাষ্ট্রদর্শন ও মানবাধিকারের দেয়ালে। সময়ের সাথে সাথে তিনি রাজনৈতিক তত্ত্বকথার অতিকথন এড়িয়ে প্রান্তিক মানুষের সংগ্রাম ও জীবন-চর্যার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। লোকায়ত জীবনচর্যা তথা প্রাকৃত ধর্ম, লোকাচার ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে মাধ্যম করে তিনি জাতীয় আত্ম-পরিচয়ের একটি গভীর, দরদী ও অরাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করেন।[১০] এই

ভিত্তিই রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত সংকীর্ণ পরিচয়ের বিপরীতে বাঙালির বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে যা রাজনীতির উচ্চমার্গ ছাড়া আর কিছুই নয়।

২

সেলিম আল দীনের নাটকে শিল্পদর্শনকে বুঝতে হলে তাঁর উদ্ভাবিত আঙ্গিক ‘কথানাট্য’, শিল্পের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং প্রাচ্য জীবনবোধের ‘প্রাকৃত ধর্ম’কে বুঝতে হবে। এই প্রপঞ্চ ত্রয়ী তাঁর সম্পূর্ণ শিল্পসৃষ্টির মেরুদণ্ড স্বরূপ। তিনি পরিণত পর্বে ইউরোপীয় ধাঁচের সংলাপনির্ভর রচনা থেকে সচেতনভাবে সরে এসে নতুন একটি আঙ্গিক নির্মাণ করেন। নাম দেন ‘কথানাট্য’। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমি কথার শাসনে নাটক রচনা করেছি তাই এর নাম দিয়েছি কথানাট্য’,[১১] যাকে তিনি বলছেন ‘কথার শাসনে’ রচিত নাটক।[১২] আর এই আঙ্গিক পরিকল্পনায় গৃহাঙ্গনে কথক বা গায়েন বা দোহারদের সাথে কিচ্ছা বা হাস্তর বলার রীতি সক্রিয়। এ ঐতিহ্যময় বর্ণনাত্মক নাট্য আঙ্গিক মূলত দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পদর্শন দ্বারা প্রভাবিত।[১৩]

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ যেমন পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে একই সাথে দ্বৈত (পৃথক) এবং অদ্বৈত (অভিন্ন) সত্তা, তেমনি নাট্যও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্প, যা একদিকে একটি স্বতন্ত্র শিল্পধারা আর অন্যদিকে সপ্তকলার সম্মিলিতরূপ। একটি তরঙ্গ যেমন সাগরের অংশ (অভেদ), একইভাবে, তরঙ্গ ও সাগর আলাদা সত্তা (ভেদ) হিসেবেও প্রতীয়মান। একদিকে পরমাত্মা ও জীবাত্মা পৃথক অন্যদিকে পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলনেই আসে মার্গ বা প্রকৃত সফলতা। একই দার্শনিক সাদৃশ্য রয়েছে সূফীবাদের মধ্যে। এ সম্পর্কে আহমেদ শরীফ বলে:

> “সূফীরা হলেন বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী তথা আত্মা-পরমাত্মারই খণ্ডাংশ। ... বৈদান্তিক অদ্বৈততত্ত্বের প্রভাবে সূফী যেমন পরিণামে পরমাত্মায় আত্মবিলুপ্তি করে, তেমনি বৌদ্ধ নির্বাণতত্ত্বের প্রভাবে ফানাতত্ত্বে অহং-এর বিলোপে আস্থা রাখে। প্রথমটির নাম বাকবিল্লাহ, দ্বিতীয়টির নাম ফানাফিল্লাহ।”[১৪]

সূফীবাদের ফানাফিল্লাহ-বাকাবিল্লাহর খেলা, বাউলতত্ত্বের ‘যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে দেহভাণ্ডে’ কিংবা বৈষ্ণবতত্ত্বের রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বা অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব— এই প্রতিটি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মৌলধারণার শিল্পদর্শন হলো সেলিম আল দীনের নাটকের দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পদর্শন। এই শিল্পদর্শন প্রাচ্য দর্শন ও বাংলা লোকনাট্যের ঐতিহ্যকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে, যার প্রভাব ও প্রয়োগ সেলিম আল দীনের পরিণত বয়সের নাটকে বর্তমান। এ যেন শিল্প ও জীবনের অখণ্ডতার অনন্য প্রকাশ। অন্যদিকে, পাশ্চত্য নাট্যরীতি নাটককে ক্রিয়া বা সংলাপে সীমাবদ্ধ করে, বর্ণনাকে (লেখককে) বাইরে রাখে; কিন্তু সেলিম আল দীন অনুভব করেন- প্রাচ্য নাট্যরীতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো বর্ণনাধর্মিতা ও সংলাপমুখীনতার যুথবদ্ধতা।[১৫] সেদিক থেকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এই সংশ্লেষণকে তাত্ত্বিক স্বীকৃতি দেয়। কেননা, এখানে জীবনের বস্তুগত বাস্তবতা আর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সত্য একই ফ্রেমে আসে। সেলিম আল দীন বলেন:

> “নাটক হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নি- নৃত্যকে করেছে তার ধমনী- কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন অঙ্গাভরণ- তার প্রাণের নিখিল লোকায়ত জীবন ও ধর্মকে অবলম্বনপূর্বক আসর থেকে আসরে পরিপুষ্ট হয়েছে। যেখানে কাব্য বা উপাখ্যানটা গেয় সেখানেও বাঙলা নাটকের রূপ ও রস স্পর্শ করা গেছে। আমাদের জনপদে নাটক এসেছে কৃত্যের ছদ্মবেশে।”[১৬]

এটি নির্দেশ করে যে ‘কথানাট্য আঙ্গিক’ ঔপনিবেশিক প্রভাবমুক্ত হয়ে দেশজ ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পকে সর্বব্যাপী মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। বর্ণনাত্মক এই রীতিতে একজন প্রধান গায়েন দোহারদের সঙ্গে

নেচে গেয়ে সুর ও বর্ণনায় ঘটনা বলে যান, ফলে এখানে বর্ণনাত্মক ও ক্রিয়াত্মক উপাদান একসঙ্গে কাজ করে।[১৭] এক্ষেত্রে সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক কথানাট্যকে ব্যাখ্যা করেছেন 'নাটক, কবিতা, নাচ, গীত, উপন্যাস, উপকথা ও কথকতার সমাহার' রূপে।[১৮] মূলত সেলিম আল দীনকেই তিনি প্রতিধ্বনিত করেছেন।

৩

আহমেদ শরীফ দেখান, এ অঞ্চলে কীভাবে সূফীবাদের আবাদ হয়েছে। তিনি বলেন:

> "ইসলাম সিরিয়ায়, ইরাকে, মিশরে, ইরাণে ও মধ্য-এশিয়ায় প্রচারিত হওয়ার পরেও সেখানকার ইহুদী, খ্রীস্টান, মানী, মজদকী, গ্রীক, বৌদ্ধ ও সর্বেশ্বেরবাদী হিন্দু মরমীয়াবাদের প্রভাব-পুষ্ট পূর্বপুরুষের সংস্কার নবদীক্ষিত মুসলিমদের মর্মমূলে থেকে যায়। ফলে দেহ, আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে তাদের উত্তরাধিকার-সূত্রে-প্রাপ্ত চেতনা অল্পকালের মধ্যেই প্রবল হতে থাকে। হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকেই সূফীমতের উন্মেষ হতে থাকে— ... হাসান বসোরী, রাবিয়া বসোরী প্রভৃতির মধ্যেই বৈরাগ্য ও আল্লাহ-প্রেমের উন্মেষ ঘটে। ... আবু হোসেন বিন মনসুর হল্লাজ ... প্রমুখ বৈরাগ্য-প্রবণ পরমাত্মার সান্নিধ্যকামী ও আত্মা-পরমাত্মার স্বরূপ সন্ধানী অদ্বৈতবাদী সূফীদের আবির্ভাব ঘটে।"[১৯]

ইতিহাস থেকে আমরা দেখি, ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন যেমন ঘটেছে, তারা যেমন বাঙালি সংস্কৃতি ও দর্শনকে নিয়েছে, তেমনি অনার্য বাঙালিরা তাদের সংস্কৃতি ও দর্শনকেও আত্মীকরণ করেছে।[২০] এই সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ভেতর দিয়েও বাঙালিরা তাদের প্রাকৃত ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিকে স্বরূপে ধরে রাখতে চেয়েছে এবং সফলও হয়েছে।[২১] তাই সেলিম আল দীনের দর্শনে ও প্রাচ্যভাবনায় ধর্ম ও দর্শন বলা যায় অভিন্নভাবে বিরাজ করেছে।[২২] এই প্রাকৃতজনের 'প্রাকৃত ধর্ম' কোনো গণ্ডিবদ্ধ ধর্মীয় মতবাদ নয়। কারণ বাঙালির চর্চা ও চর্যায় পথে এটি প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেনি, বা তত্ত্ব-দর্শন-জ্ঞানের পরিধিকে সমাকীর্ণ করে দেয়নি, বরং অবারিত জ্ঞানকাণ্ড[২৩] হিসেবেই জায়গা করে নিয়েছে। আর এর ভেতর দিয়ে 'আত্ম' সন্ধান তথা 'আপনারে চিনতে পারলে রে, যাবে অচেনারে চেনা'র দেশজ তত্ত্ব-দর্শন এ অঞ্চলের মানুষের মনে ও মস্তিষ্কে অবধারিতভাবে গেঁথে দিয়েছে। নাট্যকারের লক্ষ্য ছিল কাঙ্ক্ষিত শিল্পআঙ্গিকে ভর করে স্বভূমির পানে দৃষ্টি রেখে সেই 'আত্মানুসন্ধান' করা। যা ৩য় হিজরী শতকের একজন বিখ্যাত সূফী ওয়ায়েয ইয়াহইয়া ইবন মুয়ায আল-রাযী (২৫৮ হি:) এর বিখ্যাত উক্তির সাথে মিলে যায়, 'মান আ'রাফা নাফসাহু, ফাক্বদ আ'রাফা রব্বাহু' অর্থাৎ, 'যে নিজেকে জানল, সে তার প্রভুকে (আল্লাহকে) জানল।' অথবা 'যে নিজেকে চিনল, সে তার প্রভুকে চিনল'[২৪]। সূফীবাদের এই প্রবাদটি একইসাথে প্রাচীন গ্রিক দর্শনের 'Know Thyself' এর কথাকেই প্রতিধ্বনিত করছে। গবেষক মোহাম্মদ কুদরত-ই-হুদার মতে:

> "বৈষ্ণব দ্বৈতাদ্বৈতবাদে কৃষ্ণ যেমন পরমাত্মা এবং অগুনতি সৃষ্টি রাধা জীবাত্মা, ঠিক তেমনি সেলিম আল দীনের দ্বৈতাদ্বতৈ তত্ত্বে পরম হচ্ছে নাটক এবং অন্যান্য সাহিত্যে শাখা যেন জীব। পরমের সঙ্গে জীবের যেমন লীলার সম্পর্ক, তেমনি নাটকের মধ্যে লীলায়িত হবে অন্যান্য শিল্পবৈশিষ্ট্য। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে দ্বৈত। আবার এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হবে যে, এদের মনে হবে অদ্বতৈ।"[২৫]

এভাবে সেলিম আল দীন জীবনের গূঢ়তম অন্দরমহল থেকে ছেঁকে এনেছেন এই প্রাকৃত দর্শন-ধর্ম, সাধ-সাধ্য-সাধনা-সিদ্ধির রূপকথা বা উপাখ্যান।[২৬] এর মধ্য দিয়ে সেলিম আল দীন প্রাকৃত ধর্মের অবারিত জ্ঞানকাণ্ডকে আশ্রয় করে লোকায়ত মানুষের জীবনাচরণের মানবিকতাকে প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু-মুসলিম, খ্রিস্টান-বৌদ্ধ, আদিবাসীসহ সকলের লোকাচার ও জীবনযাপনকে প্রয়োগ করেছেন তাঁর নাটকে। এখানে নিছক নিরীক্ষার

চেয়ে নিষ্ঠার ভার বেশি। তাই তিনি জীবনের বিচিত্র ও তীব্র উদ&যাপনকে মূর্ত করে তুলতে পেরেছিলেন।[২৭] হাজার বছরের সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ তাঁর নাটকে পুষ্টি জুগিয়েছে। যেখানে আধুনিক রাষ্ট্রে ধর্মকে করে তোলা হয় বিভাজনের উপাদান, সেলিম আল দীন সেখানে স্থাপন করেন গভীর এক দার্শনিক ঐক্যসূত্র। তাঁর নাটকের দার্শনিক গভীরতা, অনুভবের মগ্নতা আর সার্বভৌম চিন্তার বদৌলতে তাঁর সৃষ্টিসমূহ, যেমন *কিত্তনখোলা* (১৯৮০) কিংবা আরও পরিণত সময়ের *স্বর্ণবোয়াল* (২০০৭) প্রভৃতি, মঞ্চ-নিরোপেক্ষ পাঠযোগ্যতা লাভ করেছে।[২৮] আর এর মূলে রয়েছে প্রাচ্য দর্শন ও নাট্যরীতির বর্ণনাত্মক কৌশল, এখানেই তাঁর মৌলিকত্ব।

উদাহরণস্বরূপ, *কিত্তনখোলা* নাটকের কথা বলা যায়। নাটকের আখ্যান স্বল্প সময়ের মধ্যে শুরু ও শেষ হলেও এর পরিসর ত্রিকাল-সঞ্চারী (অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ)।[২৯] সেলিম আল দীন উত্তরকালের রূপান্তর সচেতন শিল্পী বলেই বলতে পারেন, “রূপান্তরের সামাজিক পর্ব রচনার একমাত্র প্রবণতাকে আমি এড়াতে পেরেছি বলে আমার বিশ্বাস।”[৩০] নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোনাইয়ের দাদার পিতা পেশায় ছিল ‘জোলা’, দাদা রইসুদ্দি পিতার পেশা ছেড়ে হন কৃষক, আর সোনাই হয়েছে দিনমজুর। আর নাটকের শেষ দেখা যায় সে সাপ ধরার তন্ত্রমন্ত্র শিখে সাপ ধরা আয়ত্ব করে নতুন পেশার জন্য মনস্থির করছে। এই রূপান্তর কেবল সোনাইয়ের একার রূপান্তর নয়। নাট্যকার একে জীবনের সামগ্রিক রূপান্তর হিসেবেই দেখছেন। এ রূপান্তর অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য। এখানেই সেলিম আল দীনের দার্শনিকোচিত নির্মোহতা ও জীবনবোধের গভীরতা নিহিত। জীবনসত্যের প্রকাশ দেখি সোনাইয়ের সংলাপে, ‘এক জনমে জরম হয় অনেকবার।’ অথবা শামসুল বয়াতি বলেছে, ‘এ হইতেছে রূপ বদলের লড়াই বাবা। এক রূপ চিরদিন থাকে না।’ মোহাম্মদ কুদরত-ই-হুদার মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য, “এই যে রূপান্তর, এই রূপান্তর নিয়ে সোনাই এবং নাট্যকার কারো মধ্যেই কোনো প্রথাগত হাহাকার নেই।”[৩১] বরং *কিত্তনখোলা* নাটকের পটভূমি কয়েকদিনের মেলাকে কেন্দ্র করে শুরু হলেও, এতে মনসা দেবীর জীবন-কাহিনি, লাউয়া তথা বেদে সম্প্রদায়ের জন্মোৎসব এবং প্রতিটি চরিত্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিত্র বর্ণিত হয়[৩২]। ক্ষণস্থায়ী এই মেলা জগৎ সংসারের সাময়িক সময়ের প্রতীক, মেলা শেষ হলে মর্মান্তিক শূন্যতায় জীবনের খেলা সাঙ্গ হয়। এই কালচেতনা কেবল আঙ্গিকগত নয়, বরং জীবনের চিরায়ত দার্শনিক চক্রের প্রকাশ। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পদর্শন এই চিরায়ত ও অখণ্ড মানবজীবনকে তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছে। নাট্যকার নাটকের মধ্যে নিজেকে কথক হিসেবে নিয়ে আসেন এবং মহাকাব্যিক উপন্যাসের মতো করে ঘটনা বর্ণনাও করেন। এই যে প্রাচ্যগামীতা ঔপনিবেশিক ধারার বিপরীতে, তা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পদর্শন প্রয়োগ ব্যতিরেক সম্ভব নয়।

৪

সেলিম আল দীনের পরিণত পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম *স্বর্ণবোয়াল* (২০০৭) নাটকে আমরা দেখে, নিষ্কাম কর্মযোগ ও ভাবগত বিগ্রহের স্বরূপ। নাটকটিতে প্রাচ্য দর্শন ও প্রাকৃত ধর্মের ধারণা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে। নিছক প্রকৃতি ও প্রাকৃতজনের স্বর্ণবর্ণ মৎস্য শিকারের কাহিনি এটা নয়, বরং এটি সাধনা, দর্শন ও জীবনের গূঢ় আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এ অঞ্চলের নিম্নবর্গের মানুষ পেশাকেই ধর্ম মনে করে, পেশাকেই সাধনা মনে করে। আর মৎস্য শিকার আদিমতম পেশা। তাহলে এই সাধনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী? নাট্যকারের কাছে *স্বর্ণবোয়াল* নাটক “পৃথিবীর আদিমতম সত্যের ভিতর মানুষের জয়-পরাজয়ের অতীত এক জলদিগন্ত।”[৩৩] বংশানুক্রমিকভাবে মৎস্য শিকার করে আসছে জনম মাঝি, খলিশা মাঝি ও তিরমন। এরা সারাজীবন কাল্পনিক বিশাল এই স্বর্ণবর্ণ বোয়ালের স্বপ্ন দেখে। তাদের হাসি-কান্না, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, জীবন-জীবিকা, সবকিছুর নির্ণায়ক হয়ে ওঠে এই *স্বর্ণবোয়াল*। এভাবেই একসময় এই নিকারিগোষ্ঠীর জন্য মাছটি কেবল জীবিকার উপাদান না হয়ে, সাধনার বস্তু হয়ে ওঠে। অর্থ উপার্জন বা উদরপূর্তির জন্য এই মাছের পেছনে এদের কোনো

সাধনা নেই। আবার ভারতীয় সাংখ্য দর্শন ও সূফীবাদের ছাপ দেখা যায় তিরমন-সাঁঝমালার প্রেম-গাঁথায়।[৩৪] বস্তুগত রূপ ছাপিয়ে মাছটি সম্ভ্রম ও 'সাধনার ধন' হয়ে ওঠে, যা কিনা বিশ্বাসের ভাবগত বিগ্রহ তথা কনসেপচুয়াল আইডল হয়ে দাঁড়ায়।[৩৫] সেলিম আল দীন এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামকে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। মাছ শিকার জীবিকার তাগিদ, কিন্তু '*স্বর্ণবোয়াল*' ভাবগত বিগ্রহ। গ্রামীন জনশ্রুতি বা কিংবদন্তী কখনো কখনো পালিত বা প্রচলিত বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠে যায়, হঠাৎ একদিন কী এক অলৌকিকতায় পূজনীয় হয়ে ওঠে। এখানে আদৌ কোনো কেরামতি নেই, কিন্তু বিশ্বাস আছে। এই প্রান্তিক মানুষেরা সাপ, কচ্ছপ, মাছ, গাছ, পাখি প্রভৃতিতে যে দেবত্ব আরোপ করে, তা তাদের জীবনাচারণেরই ফসল। গবেষকের ভাষায়, "*স্বর্ণবোয়াল* নাটকে জনশ্রুত মাছটি হয়তো আর এক পুরুষ পর থেকে রীতিমতো আঞ্চলিক দেবতা হয়ে উঠবে।"[৩৬] খালিশা মাঝি সোনালি মাছের অন্তর্ধানে যে গভীর শূন্যতা দেখে, সে শূন্যতা পূরণের আকাঙ্ক্ষা তার অবচেতনে ক্রিয়াশীল থাকে, যা মূলত অন্তরাত্মার ডাকের সমতুল্য।[৩৭]

স্বর্ণবোয়াল নাটকে শিকারের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের মধ্যে ভারতীয় 'কর্মযোগ' ও 'সাংখ্য' দর্শনের সমন্বয় লক্ষ করা যায়। নাটকে এই শিকারের সংগ্রাম প্রথমে জেদ বা প্রতিশ্রুত কার্য হিসেবে শুরু হলেও একসময় তা নিষ্কাম কর্মের পর্যায়ে চলে যায়। কেননা খলিশা মাঝি বা তিরমন, তাদের নিত্য লড়াই কাজের জন্য, সেখানে পাওয়ার আশার অন্তর্ধান ঘটে। খলিশা মাঝির কাছে স্বর্ণবোয়াল জীবনের সাথে সম্পর্কিত, জীবিকার সাথে নয়। যশ-খ্যাতিও এখানে মুখ্য বিষয় নয়, কারণ অলৌকিক এই স্বর্ণবোয়াল এক জীবনভর সাধনার বস্তু। এই মৎস শিকারের প্রতি তাদের একাগ্রতা ও শ্রদ্ধা কোনো লোভ বা যশ কামনার জন্য নয়। তাই এটি নিষ্কাম কর্মের দর্শনকেই প্রতীয়মান করে। অন্যদিকে, নাটকের ভেতরে 'সাংখ্য' দর্শনেরও অনুসন্ধান করা যায়। প্রকৃতি ও পুরুষের সম্পর্ক এখানে পরিদৃশ্যমান। স্বর্ণবোয়াল এখানে 'প্রকৃতি' যা অনন্ত, রহস্যময় ও মায়াময় আর শিকারি জনমমাঝি, খলিশামাঝি বা তিরমন হলো 'পুরুষ' বা মানুষের বিশুদ্ধ চেতনা। পুরুষ যেমন প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট হয়ে মায়ার জালে জড়ায়, তেমনি নাটকের শিকারিরা এক আদিম আকর্ষণে স্বর্ণবোয়ালের পেছনে ছুটে চলে। নাটকের জেলেপল্লির জনমমাঝি, খলিশামাঝি বা তিরমনরা এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও মোহ দ্বারা চালিত। যদিও স্বর্ণবোয়ালকে ধরার এই আদিম তৃষ্ণা বা মোহ তাদের পূর্বপুরুষদেরকে জলের অতলে নিয়ে গেছে। সাংখ্য দর্শনের ভাষায় এটিই হলো প্রকৃতির মায়ায় পুরুষের বন্ধনদশা ও দুঃখের কারণ।

৫

২০০৩ সালে প্রকাশিত *বনপাংশুল* নাটকে সেলিম আল দীন মান্দাই নৃগোষ্ঠীর বাস্তব জীবনালেখ্য তুলে ধরেছেন। মান্দাইরা টাঙ্গাইল (বিশেষ করে সখীপুর), ময়মনসিংহ ও মধুপুর গড়াঞ্চলে বসবাসকারী একটি প্রাচীন ও বিলুপ্তপ্রায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। ঐতিহাসিকভাবে নিতান্ত নিরীহ, শিব বা প্রকৃতিপূজারী ও বননির্ভর এ সম্প্রদায়, তাদের অস্তিত্ব, তাদের ধর্ম ও সংস্কার, তাদের সংস্কৃতি ও পরিবেশ তথাকথিত আধুনিকতা, আসলে ভক্ষক দখলদারদের নিষ্ঠুর থাবায় ক্রমশ ধ্বংসের পথে। এই নাটক তাদের জীবন-সংঘাত, সংগ্রাম ও সংস্কৃতির রক্তাক্ত পাঁচালি। এ নাটকের কেন্দ্রীয় সংঘাত শুরু হয় ভূমি দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে, যেখানে অর্থলোভী বাঙালি মহাজনদের সাথে মান্দাই সম্প্রদায়ের সংঘাত দেখানো হয়। এই অর্থনৈতিক শোষণ কেবল ভূমি দখলেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি বিস্তৃত হয় সাংস্কৃতিক পৌরাণিক বিশ্বাসের জগৎ পর্যন্ত। ভূমি হারানোর ফলে যে জাতিগত ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় আসে, তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাস (কৃত্য) তাদের সামাজিক কৃষ্টি ও ঐতিহ্য রক্ষার মূল উপাদান হয়ে দাঁড়ায়।

সেলিম আল দীনের নাটকে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, আদিবাসী মানুষের অসংখ্য লোক-উৎসব, পূজা-পার্বণ, লোকাচার, গল্প-গাথা এবং জীবনাচরণ স্থান পেয়েছে।[৩৮] নৃ-গোষ্ঠীগুলোর ধর্ম, ভাষা, পুরাণ, বিশ্বাস,

সংস্কার এবং প্রাচীনত্ব ও আধুনিক জীবনের টানাপোড়েকে সুনিপুণ দক্ষতায় নাট্যরূপ দিয়েছেন তিনি।[৩৯] সেলিম আল দীন প্রাচ্য নাট্যরীতির বর্ণনাত্মক দার্শনিক ভিত্তিকে সুসংহত করার জন্য মধ্যযুগীয় পুরাণ ও লোকাচারকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রতীকী ও দার্শনিক প্রতীতিতে পুনর্নির্মাণ করেছেন।

সেলিম আল দীন রচিত *প্রাচ্য* নাটকটি তাঁর ১৯৯৮ সালের রচনা। নাটকটিতে তিনি বাঙালির পরিচিত মনসামঙ্গল থেকে কাহিনি গ্রহণ করলেও তাকে সমকালের প্রেক্ষাপটে পুনর্নির্মাণ করেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এখানে দার্শনিক পুনর্নির্মাণ দেখা যায় সর্প প্রতীকের ব্যবহারে। নাট্যকার সর্পকে একটি অশুভ শক্তি হিসেবে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিক করে তোলার সাথে লোকবিশ্বাসকে আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক উপাদানে রূপান্তরিত করেছেন।

সেলিম আল দীনের *চাকা* (১৯৯১) নাটকের শেষ দৃশ্যে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায়, একদম প্রান্তিক সুবিধা বঞ্চিত বাহের গাড়োয়ান বা শুকুরচান বা প্রৌঢ়রা যখন নয়ানপুর, নবীনপুরসহ গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে অজ্ঞাত পরিচয়হীন বেওয়ারিশ মৃত যুবকের কোনো অভিভাবক বা আত্মীয়ের হদিস পায় না, এদিকে দীর্ঘপথ আর দীর্ঘসময় পেড়িয়ে গেছে, গলিত লাশের দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, তখন তারা সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে এক করুণ, মর্মান্তিক ও চরম মানবিকতার পরিচয় দেয়। বেওয়ারিশ লাশটি তখন কেবল লাশ থাকে না, লাশের প্রতি মায়া জন্ম নেয়। অন্যায়ের শিকার হওয়া মৃত মানুষটির জন্য তারা তীব্র কষ্ট অনুভব করে। কেবল বিবেক ও মানবিকতার কারণে জাত, ধর্ম, রাজনৈতিক পরিচয় ভুলে তারা লাশটিকে কাঁধে তুলে নেয়। চাকা নাটকের এই শেষ পরিণতি নিঃসন্দেহে 'মানব ধর্ম' বা মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বাহের গাড়োয়ান বা তার সহযোগীরা কিন্তু নাটকের শুরু থেকে এই মানবধর্মের চেতনায় চালিত হয়নি। সময়, পরিস্থিতি ও মনুষ্যত্ব তাদেরকে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে মানবতার চরম উচ্চতায় নিয়ে গেছে। শেষ দৃশ্যে তাদের কান্না সবাইকে কাঁদায়, সে কান্না বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে। এ বিশ্বজনীন বেদনা মৃত মানুষটির জন্য ততটা নয়, যতটা বাহের গাড়োয়ানদের মানবিক বোধ ও ব্যথার জন্য। সেলিম আল দীনের নাটকের অন্যান্য প্রায় সকল নাটকেই, যেমন- *কেরামতমঙ্গল* (১৯৮৬), *হরগজ* (১৯৯২), *হাতহদাই* (১৯৯৭) কিংবা *নিমজ্জন* (২০০২) প্রভৃতি, কোনো না কোনোভাবে মানুষের ভেতরের চিরন্তন সত্য, অস্তিত্বের সংকট এবং মানবধর্মকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে।

কেরামতমঙ্গল (১৯৮৬) নাটকে জীবনসংগ্রাম, সমাজের নানা অন্যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও শোষণের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে কেরামত একসময় বুঝতে পারে ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে মানুষের কল্যাণ ও মানবতার সেবা করাই জীবনের আসল উদ্দেশ্য। নিজের জীবনের ট্র্যাজেডিকে ছাপিয়ে কেরামতের পরার্থপরতা আর মানবসেবার ব্রতই নাটকটিকে মানবধর্মের অনন্য শিল্পরূপ দিয়েছে। *হরগজ* (১৯৯২) চাকার পর তাঁর আরেকটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ১৯৯১ সালের প্রলঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া হরগজ গ্রামে যখন ক্ষতবিক্ষত মানুষের লাশ আর হাহাকার, তখন বেঁচে থাকা মানুষগুলো সমস্ত স্বার্থ ভুলে একে অপরের জীবন বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ যেন বিপুল ভালোবাসার বিশুদ্ধ মানবধর্মের প্রকাশ।

নোয়াখালী অঞ্চলের সাগর উপকূলবর্তী খেটে খাওয়া মানুষের নিয়ত সংগ্রামে নিমজ্জিত জীবনের আখ্যান *হাতহদাই* (১৯৯৭)। প্রকৃতির হেন বিপর্যয়ে রুক্ষ জীবনেও তাদের পারস্পরিক সহমর্মিতা, সরলতা ও একাত্মতাকে এই নাটকে তুলে এনে মূলত মানবধর্মকেই মহিমান্বিত করেছেন নাট্যকার। সেলিম আল দীনের আরেকটি মহাকাব্যিক সৃষ্টি *নিমজ্জন* (২০০২) বিশ্বজুড়ে ঘটে যাওয়া গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের

বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ। জাতিগত দাঙ্গা, যুদ্ধ ও নির্মমতায় লাঞ্ছিত মানবতার আলেখ্য এই নাটক। বিশ্বমানবের বিবেক জাগ্রত করে মর্মমূলে সর্বজনীন মানবিক পৃথিবী গড়ে তোলার আহ্বান এই নাটক।[৪০]

৬

নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন বাংলা নাট্য-ইতিহাসে এক যুগসৃষ্টিকারী নাট্যকার যিনি নাট্যধারায় আঙ্গিক ও বিষয়বৈচিত্র্যে এনেছেন মৌলিক যোজনা। তিনি আঙ্গিক ও শিল্পদর্শনের সাথে প্রাচ্য দর্শনের করেছেন দ্বিবিধ সমন্বয়, অর্থাৎ আঙ্গিক কৌশলে যেমন করেছেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মতো প্রাচ্য দর্শনের তাত্ত্বিক সমন্বয়, তেমনি নাটকের উপজীব্য হয়েছে সূফী-বাউল- বৈষ্ণবীয় থেকে জারিত মানব ও প্রেম ধর্ম। মহাকাব্যিক বয়ানে তাঁর নাটক হয়ে উঠেছে ত্রিকালসঞ্চারী। পাশ্চাত্য কাঠামো ও নন্দনতত্ত্বের বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রাচ্য ধর্ম ও দর্শনকে উপজীব্য করে দেশজ নন্দনতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণ করে নবযুগ সৃষ্টি করেছেন তিনি। সেলিম আল দীনের নাটকে চারটি প্রধান দার্শনিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, প্রাচ্যমুখী নাট্য-আঙ্গিক এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, যেখানে তিনি পাশ্চাত্য আঙ্গিক বর্জন করে কথানাট্য ও উপাখ্যানের মতো বিলুপ্তপ্রায় দেশজ আঙ্গিকের পুনঃপত্তন করে নতুন নাট্যধারা নির্মাণ করেন যেখানে দ্বিমুখী দ্বৈতাদ্বৈতবাদী প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, কাঠামোতেও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, দর্শনেও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। এই দর্শন বর্ণনা এবং ক্রিয়ার অখণ্ড মিলনে তাঁর নাটক মানবজীবনের মহাকাব্যিক পরিসরকে ধারণ করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয়ত, প্রাকৃত ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়বাদ যেখানে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কাঠিন্যের বিপরীতে বাঙালির প্রাকৃত ধর্ম ও দর্শনকে এক অবারিত জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে তুলে এনেছেন সেলিম আল দীন। এই প্রাকৃত ধর্ম হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, আদিবাসী মানুষের লোকাচার ও কৃত্যকে একীভূত করে, যা গভীর সাংস্কৃতিক ঐক্যের পাটাতন তৈরি করে।

তৃতীয়ত, নিষ্কাম কর্মযোগ ও সাংখ্য দর্শন, যেখানে অস্তিত্বের সংগ্রামে পরিণত নাট্যদর্শন, বিশেষত *স্বর্ণবোয়াল* নাটকে, প্রান্তিক মানুষের অর্থনৈতিক সংগ্রামকে নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নীত করে। বনপাংশুল নাটকের মতো নৃগোষ্ঠী নাটককে ধর্মীয় কৃত্যকে জাতিগত ঐতিহ্য সংরক্ষণের এবং ভূমি ভিত্তিক শ্রেণিসংগ্রামের শেষ হাতিয়ার হিসেবে দেখা যায়।

চতুর্থত, মানবধর্ম যা মোটদাগে তাঁর সকল নাটকেরই চূড়ান্ত অভিষ্ট। সকল ধর্ম ও দর্শনকে তিনি নির্বিশেষ মানবধর্মের দিকেই ধাবিত করেছেন। প্রাচ্যের সকল তত্ত্ব ও দর্শনের চুড়ান্ত অভিষ্ট হয়ে পড়েছে মানবধর্ম। এটিই সেলিম আল দীনের দার্শনিক পদযাত্রা। এই রূপান্তর নির্দেশ করে যে নাট্যকার বস্তুবাদী সংগ্রামকে ছাড়িয়ে জীবনের মহত্তম সত্য ও দার্শনিক সমাধানের দিকে পৌঁছাতে চেয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. মণ্ডল, লাবন্য। *সেলিম আল দীনের 'স্বর্ণবোয়াল': প্রসঙ্গ প্রাচ্য দর্শন*। থিয়েটারওয়ালা লিটিল ম্যাগাজিন, সংখ্যা ৩১, ২০১৮।

২. তদেব।

৩. হাসান, অনুপম, *সেলিম আল দীন-এর নাটকে প্রান্তিক মানুষ ও সমাজ-জীবন*, ঢাকা, থিয়েটারওয়ালা লিটিল ম্যাগাজিন, সংখ্যা ২৪, ২০০৮।

৪. তদেব।

৫. তদেব।

৬. প্রাগুক্ত, মণ্ডল, লাবন্য, *স্বর্ণবোয়াল*।

৭. প্রাগুক্ত, হাসান, অনুপম, *প্রান্তিক মানুষ ও সমাজ-জীবন*।

৮. তদেব।

৯. উদ্দীন, মুহাম্মদ কামাল। *সেলিম আল দীনের নাটকে রাজনৈতিক ভাবনার বিকাশ; অনিকেত অন্বেষা থেকে কেরামতমঙ্গল*। ঢাকা, থিয়েটারওয়ালা লিটিল ম্যাগাজিন, সংখ্যা ২৭, (২০০৯)

১০. প্রাগুক্ত, মণ্ডল, লাবন্য, *স্বর্ণবোয়াল*।

১১. দীন, সেলিম আল। *চাকা*। ১ম-প্র, ঢাকা: গ্রন্থিক, (১৯৯১), কথাপুচ্ছ অংশ।

১২. হোসেন, ছানোয়ার। *সেলিম আল দীনের নাটক ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব: একটি পর্যালোচনা*। জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি জার্নাল, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ সংখ্যা-৩১, (২০২৪) পৃ. ৬১-৬২।

১৩. তদেব।

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার (সম্প.)। আহমেদ শরীফ, *বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনচিন্তা*। নবপ্রকাশ, কলকাতা, (১৯৫৯), পৃ-৭ (ভূমিকা)।

১৫. কুদরত-ই-হুদা, মোহাম্মদ। *কিত্তনখোলা: 'ইউরোপীয় নাট্যরীতির উল্টা যাত্রাপথ'*। সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ৫২, সংখ্যা-২, (২০১৬), পৃ- ১৮৯-১৯৯।

১৬. সেলিম আল দীন। *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৪*। সাইমন জাকারিয়া (সম্পা.), ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, (২০০৯), পৃ. ৩২৬।

১৭. প্রাগুক্ত, *নাটক ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব*।

১৮. প্রাগুক্ত, দীন, সেলিম আল, *চাকা*, পৃ. ৫।

১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার (সম্প.)। আহমেদ শরীফ, *বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনচিন্তা*, নবপ্রকাশ, কলকাতা, (১৯৫৯), পৃ-৭ (ভূমিকা)।

২০. তদেব।

২১. প্রাগুক্ত, আহমেদ শরীফ, *বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনচিন্তা*। নবপ্রকাশ, কলকাতা, (১৯৫৯), পৃ-১৭৫-১৮১।

২২. প্রাগুক্ত, মণ্ডল, লাবন্য, *স্বর্ণবোয়াল*।

২৩. প্রাগুক্ত, মণ্ডল, লাবন্য, *স্বর্ণবোয়াল*।

২৪. সাখাবী, আল-মাকাসেদ, পৃ. ৪১৬; যারকানী, মুখতাসারুল মাকাসিদ, পৃ. ১৮৬; মোল্লা আলী কারী, আল-আসরার, পৃ: ২৩৮; আল- মাসনুয়, পৃ: ১৫৫।

২৫. প্রাগুক্ত, কুদরত-ই-হুদা, মোহাম্মদ, *ইউরোপীয় নাট্যরীতির উল্টা যাত্রাপথ*।

২৬. প্রাগুক্ত, মণ্ডল, লাবন্য, *স্বর্ণবোয়াল*।

২৭. প্রাগুক্ত, আহমেদ শরীফ, *বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনচিন্তা*, নবপ্রকাশ, কলকাতা, (১৯৫৯), পৃ-৭ (ভূমিকা)

২৮. প্রাগুক্ত, কুদরত-ই-হুদা, মোহাম্মদ, *ইউরোপীয় নাট্যরীতির উল্টা যাত্রাপথ*।

২৯. প্রাগুক্ত, কুদরত-ই-হুদা, মোহাম্মদ, *ইউরোপীয় নাট্যরীতির উল্টা যাত্রাপথ*।

৩০. দীন, সেলিম আল, *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খন্ড, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, (২০০৬), পৃ- ৩৩৮।

৩১. প্রাগুক্ত, কুদরত-ই-হুদা, মোহাম্মদ, *ইউরোপীয় নাট্যরীতির উল্টা যাত্রাপথ*।

৩২. প্রাগুক্ত, কুদরত-ই-হুদা, মোহাম্মদ, *ইউরোপীয় নাট্যরীতির উল্টা যাত্রাপথ*।

৩৩. প্রাগুক্ত, মণ্ডল, লাবন্য, *স্বর্ণবোয়াল*।

৩৪. প্রাগুক্ত, মণ্ডল, লাবন্য, *স্বর্ণবোয়াল*।

৩৫. প্রাগুক্ত, মণ্ডল, লাবন্য, *স্বর্ণবোয়াল*।

৩৬. প্রাগুক্ত, মণ্ডল, লাবন্য, *স্বর্ণবোয়াল*।

৩৭. প্রাগুক্ত, মণ্ডল, লাবন্য, *স্বর্ণবোয়াল*।

৩৮. প্রাগুক্ত, *বাঙালীর ধর্ম ও দর্শনচিন্তা,* নবপ্রকাশ, কলকাতা, (১৯৫৯), পৃ-৭ (ভূমিকা)।

৩৯. প্রাগুক্ত, হাসান, অনুপম, *প্রান্তিক মানুষ ও সমাজ-জীবন*।

৪০. খান, মোঃ কামালউদ্দিন, *সেলিম আল দীন প্রণীত নিমজ্জন: গঠনকাঠামো বিশ্লেষণ,* জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, (২০২১). পৃ-১৪৯-১৫৯।